সর্বোচ্চ শৃঙ্গের মিলনমেলা থেকে

রাহুল রায়

১৬ ডিসেম্বর ২০২০ - ০২ জানুয়ারি ২০২১

পর্ব ১

পাহাড়ের হাত-পা আছে শুনলে মানুষ পাগলের প্রলাপ বলে যতই হাসি ঠাট্টা করুক না কেন ভ্রমণ পিপাসু মানুষের কাছে কিন্তু এটা ষোল আনা সত্য কথা । যখন তখন তাদের চিন্তায় পাহাড় লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে আসে৷ পাহাড় তাদের হাতছানি দিয়ে নিজের কাছে ডাকে । সেই ডাক এতই অমোঘ যে তাকে বেশিদিন অগ্রাহ্য করে থাকা যায় না। দেশজুড়ে করোনা সংক্রমণ, লকডাউনের বজ্রকঠোর বাধা নিষেধের মধ্যে প্রাণপাখীর তখন হাঁসফাঁস অবস্থা। একটু নতুনত্বের জন্য হা-পিত্যেশ করছে, এদিকে পাহাড়ের সেই না কভূ না বিরতি নেওয়া আহ্বান যেন দিনের পর দিন আরো অপরিহার্য হয়ে উঠছে, এমন এক পরিস্থিতিতে চার বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বেরিয়ে পড়ার। লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান সান্দাকফু। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে শিলচর থেকে বেরিয়ে পড়া হল। তার আগে স্থানীয় একটি ট্যুর এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে ভ্রমণের সব ব্যবস্থা সেই এজেন্সিই করবে। নতুন জায়গায় গিয়ে এই সব ঝামেলা মাথায় নেওয়ার কোনো মানে হয় না। যাই হোক পরের দিন সকালে শিলিগুড়ি পৌঁছেই সংশ্লিষ্ট ট্যুর এজেন্সির দেওয়া গাড়ী করে বেরিয়ে পড়লাম কমলালেবুর দেশ বলে পরিচিত সিটঙ্গের উদ্দেশ্যে। তবে শিলিগুড়ি পেরোতে হলো না, লকডাউন ও নভেম্বরের পরিষ্কার আকাশের সৌজন্যে গাড়ির সামনেই ভেসে উঠলো সুবিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোভিরাম দৃশ্যপট ।

সবুজে ঘেরা পাহাড়ের পঙ্কিল রাস্তায় প্রায় তিন ঘন্টার গাড়ী সফর শেষে পৌঁছানো হল আমাদের প্রথম দিনের আস্তানাতে। ভিলেজ রিট্রেট, স্থানীয় গোর্খা পরিবারের দ্বারা পরিচালিত একটি হোম-স্টে। পাহাড়ের গায়ে তৈরি করা দো'তলা বাড়িটি নানা রঙের ফুলে ভরা । ছোট বাড়িটির পেছনে সবুজ সমাবেশ এবং তারপর যত দূর দেখা যায় একের পর এক নীল পাহাড়ের ভিড়। সেখানে কিছুটা সময় বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়া হল। পরবর্তী গন্তব্য আহালদাড়া পার্ক। সিটিং গ্রামটি পাহাড়ের গা ঘেঁষেই তৈরী। জনবসতি সেরকম নেই । কমলালেবুর বাগানের জন্যই মূলতঃ এই জায়গাটার খ্যাতি । রাস্তার দু'ধারে কমলা লেবুর গাছ, পরিপাটি করে গড়ে তোলা ঘর, ফুলের সমারোহের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো । পাহাড়ের মধ্যে তৈরী একটি ছোট্ট পার্ক আহালদাড়া । তবে পার্কটির ভৌগলিক অবস্থান অত্যন্ত সুন্দর। পার্কটির একদিকে যেমন একের পর এক তুষার আবৃত পর্বতশৃঙ্গের দেখা মেলে তেমনি অন্য দিকে আছে বিস্তৃত সবুজ পাহাড়ের সমারোহ এবং তার মধ্যে গড়ে ওঠা ছোট ছোট জনপদের দৃশ্য । সুউচ্চ আহালদাড়া থেকে দূরের শ্বেত শুভ্র পর্বত, কার্পেট সদৃশ চা বাগান, রং-বেরঙের ঘরবাড়ী বিশিষ্ট জনপদ ও সবুজ-নীল পাহাড়ের এই বিচিত্র সমাহার ছিল অত্যন্ত মনোরম । ঘন্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে বেরোলাম নামথাঙ্গ লেকের দিকে। নামে হ্রদ হলেও শীতের মরশুমে সেখানে জল পাওয়া যায় না । সেখানে পাইন গাছের ঘনবসতিতে আলো আধারির খেলার মধ্যে কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরে আসা হল । দুপুরের খাওয়া তৈরীই ছিল, তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে একটু সময় বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম মহানন্দা অভয়ারণ্যের উদ্দেশ্য । উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম পুরানো এই অভয়ারণ্যটি প্রাণবৈচিত্রে অত্যন্ত সমৃদ্ধ । ৩৩০ রকম গাছ ছাড়াও ২৪৩ রকম পাখী , বাঘ, হাতী ছাড়াও নানারকম জন্তু এখানে পাওয়া যায় । পাখীপ্রেমীদের কাছে এই অভয়ারণ্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় । পক্ষীপ্রেমীরা মূলতঃ ভোরের দিকে এখানে ভিড় করেন । তবে বিকালেও গাছের ফাঁকে ক্যামেরা হাতে নিয়ে দাঁড়ানো কিছু মানুষ পাওয়া গেল । নাম না জানা অজস্র পাখীর কাকলি ও গাছের নিবিড় ছায়ার মধ্যে প্রায় ঘন্টা দুয়েক কাটিয়ে অন্ধকার হওয়ার আগে বেরিয়ে পড়লাম আমরা । জনবিরল রাস্তা পেরিয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। এখানে স্থানীয় মানুষ একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়েন, সন্ধ্যার জলখাওয়ারের পর রাতের খাওয়ার আসতে বেশি সময় লাগে নি ।

নতুন কোনো জায়গায় ঘুরতে গেলে ভোরবেলা হেঁটে হেটেঁ সেই জায়গাটা ঘুরে দেখা আমার বরাবরের অভ্যাস, এবারও তার তার ব্যাঘাত ঘটল না। নিরিবিলিতে কাছেপিঠের জায়গা ঘুরে দেখার সেরা সময় এটাই। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম শুধু বাড়ির সীমার ভেতরে নয়, ওখানে প্রতিটি বাড়ির সামনে অত্যন্ত যত্ন করে ফুলের গাছ লাগানো হয়, আমাদের মতো ওখানে ফুল বা গাছ চুরী হয় না বরং সেখানে সবাই গাছের যত্ন নেয় । ছোট্ট সুন্দর এই গ্রামটি ধীরে ধীরে ভ্রমণপিপাসুদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে । দার্জিলিংয়ের ভিড়ের বাইরে একটি বিকল্প নিজের মধ্যেই তৈরী হচ্ছে । ফিরে এসে বন্ধুদের সঙ্গে প্রাতঃরাশ সেরে সিটিং থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আজকের গন্তব্য মানেভঞ্জন। পাহাড় থেকে নেমে তিস্তা নদীর তীর বেয়ে আমরা এগিয়ে চললাম । শীতের মরশুম হওয়ায় নদীতে জল অনেকটাই কম । পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকা বাঁকা পথ ধরে প্রায় এক ঘন্টা চলার পর গাড়ী থামল লাভরস ভিউ পয়েন্টে । এই জায়গা থেকে নীচে রাঙ্গিত ও তিস্তা নদীর মিলন কেন্দ্র দেখা যায় । ক্যামেরার সদ্ব্যবহার করে আবার যাত্রা শুরু করা হল । পাহাড়ের চড়াই বেয়ে গাড়ী চলতে থাকে । কিছু সময়ের পরই মেঘ ও গাছের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘার লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে যায় । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে তার অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে যেন আরো বিস্তৃত হয়ে চোখের সামনে উঠে আসছিল । এবার গাড়ী থামল লামাহাট্টা ইকো পার্কের সামনে । নানা রকম গাছ, রংবেরঙের ফুলে শোভিত পার্কটি অধুনা উত্তরবঙ্গের ভ্রমণার্থীদের একটি অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য । পার্কটির প্রধান আকর্ষণ একটি পবিত্র হ্রদ। সেখানে যেতে প্রায় ৭৫০ মিটার চড়াই ভাঙতে হয় । লামাহাট্টা পার্ক থেকে দার্জিলিং শহর ও তার ওপরে কাঞ্চনজঙ্ঘার অবস্থান খুব সুন্দর ভাবে পরিলক্ষিত হয় । অগণিত পাইন ও ধুপি গাছের মধ্যে গড়ে ওঠা পার্কটিতে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করা হল । যাওয়ার পথে চোখে পড়ল ভারতের সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন ঘুম । ভাবতে আশ্চর্য হয় যে স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা এই তকমা অন্য কোনো স্টেশনকে দিতে পারিনি । এবার কিছু সময়ের জন্য গাড়ী থামল লেপচাজগতে । আগে জায়গাটিতে মূলতঃ স্থানীয় লেপচা সম্প্রদায়ের লোকেদের শেষকৃত্য করা হলেও বর্তমানে এটি একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠছে । আবার শুরু হল পথচলা । পথক্লান্ত চারজনকে নিয়ে দুপুর গড়ানোর আগেই মানভঞ্জন পৌঁছানো হল।

পর্ব ২

ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত সবুজে ঘেরা একটি ছোট গ্রাম মানেভঞ্জন । এখানে পর্যটকদের জন্য কিছুই নেই, সান্দাকফু যাওয়ার পথে রাত কাটানোর জন্যই মূলতঃ ব্যবহৃত হয় । গ্রামের রাস্তার একদিক ভারত, অপরদিক নেপাল । অবস্থানটা এরকমই যে পর্যটকদের জন্য থাকার জায়গা যেখানে করা হয়েছে ভারতে, খাওয়ার ব্যবস্থা করা আছে ওপাশে, নেপালে । সিটাং ভৌগলিক দিক থেকে শিলচর থেকে উচুঁতে হলেও সেখানে তাপমাত্রার তারতম্য বেশী ছিল না। কিন্তু মানেভঞ্জনে সন্ধ্যার পর শৈত্যপ্রবাহ ভালো ভাবেই অনুভূত হয় । সীমানা পেরিয়ে নেপালে যেতে কোনো বাধা নিষেধ নেই । পরেরদিন ভোরে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিলাম । কিছু সময় পরেই চোখে পড়ল এই পথের বিখ্যাত ল্যাণ্ড রোভার । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরী এই গাড়ী আজকের দিনে পৃথিবীতে একমাত্র এই পথেই ব্যবহৃত হয় । স্বাভাবিক ভাবেই পর্যটকদের মধ্যে এই গাড়ী নিয়ে আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি থাকে । মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু পায়ে হেঁটে ঘুরে আসতে যেখানে চার থেকে পাঁচ দিন লাগে, গাড়ী ব্যবহার করলে দু'দিনেই ঘুরে আসা যায় । ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও নিরাপদ এই গিরিপথে পা হেঁটে ঘুরে আসাটা সবদিক থেকেই শ্রেয়, কিন্তু সময়ের অভাবে আমাদের চার চাকার ব্যবহারই করতে হল । সকাল সকাল পর্যটন অফিস থেকে পাস নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চারমূর্তি।

সান্দাকফু একাধিক কারণে পর্যটকদের মধ্যে জনপ্রিয় । প্রথমতঃ পুরো পথটাই গাড়ী দিয়ে যাওয়া যায় যার ফলে সব বয়সের মানুষের কাছেই সান্দাকফু সহজলভ্য। দ্বিতীয়তঃ এই গিরিপথে পাওয়া যায় প্রায় ৬০০ রকম অর্কিড ফুল । পৃথিবীর আর কোথাও এতো রকম অর্কিড পাওয়া যায় না । বসন্তে এই গিরিপথ পৃথিবীর শোভনীয় গিরিপথের মধ্যে একটি হয়ে ওঠে । তৃতীয়তঃ সান্দাকফু থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাঁচটি পর্বতের মধ্যে চারটি যথাক্রমে মাউন্ট এভারেস্ট , কাঞ্চনজঙ্ঘা সহ ঘুমন্ত বুদ্ধ, লোৎসে ও মাকালু দেখা যায় । পথের দু'ধারে বিন্যস্ত প্রাকৃতিক ও মধ্যে মধ্যে মানবিক কলাকৌশলী উপভোগ করে আমরা এগিয়ে চললাম । এখানে জায়গায় জায়গায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর শিবির খাটানো আছে । এত উঁচুতেও এখানে রাস্তাঘাট কিন্তু খুব ভালো , আমাদের মতো শহরের রাস্তা লজ্জা পাওয়ার অবস্থা । শীতকালে আসায় পথপাশে অর্কিড বা রোডোডেনড্রোন চোখে পড়ে নি , বসন্তে হয়তো সেই অনুতাপ হতো না । তবে সুনীল আকাশের নীচে চিত্রে , টাংলুর ছোট ছোট ঘরবাড়ি , বৌদ্ধ মন্দিরের পরিচিত্র নিজের মধ্যেই অনন্য । প্রায় ঘণ্টা দেড়েক যাত্রা করার পর সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে পৌছালাম । ওক, পাইন, বির্চ মাগ্নোলিয়া প্রিমুলাস ও সর্বোপরি বৈচিত্রে ভরা অর্কিডের সমাহারে সমৃদ্ধ এই জাতীয় উদ্যানে ১২০ রকমের পাখী ও নানা ধরণের পাহাড়ী জন্তু পাওয়া যায় । এবারে গাড়ী থামলো কালপোখরীতে । আদতে এটি একটি পাহাড়ি হ্রদ , স্থানীয় মানুষ এই হ্রদটিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করেন, বলা হয় যে এই হ্রদের জল কখনো বরফে পরিণত হয় না । এই হ্রদের জলের রং কালো থেকেই এই হ্রদের নামকরণ । এই গিরিপথে অবিরত ভাবে নেপাল ভারত সীমানা ধরে এগিয়ে এবার আধিকারিক ভাবে পাস নিয়ে নেপাল প্রবেশ করা হল । তবে এখান থেকে রাস্তা কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ । স্থানীয় গাড়ীচালক ছাড়া এই জায়গায় গাড়ী চালানোর চিন্তা করতেও বোধহয় যথেষ্ট সাহসী হতে হবে । যাই হোক, বিকাল হওয়ার আগেই সান্দাকফু পৌঁছালাম আমরা।

সান্দাকফুতে সরকারী থাকার ব্যবস্থা থাকলেও আমরা উঠলাম নেপালী হোটেলে , সানরাইজ হোটেল । পরিষ্কার-পরিপাটি হোটেলটিতে আপ্যায়নে কোনো কার্পন্য হয় না । এখানে পরিষেবা আধুনিকরণের কাজ চলছে । জায়গাটির অন্যতম বৈশিষ্ট এখানে সূর্যোদয় যেমন অনিন্দ্যসুন্দর সূর্যাস্তও তেমনি মনভোলানো । কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তার পরিবারের ওপর সূর্যের শেষ রশ্মীরাশির প্রতিফলন দেখার মতো । পর্বতের ওপর সূর্যের এই বর্ণিল খেলা পথক্লান্তি দূর করতে সময় নেয় না । এদিকে আকাশের একদিকে এই খেলা শেষ হতে না হতেই অন্যদিকে পূর্ণিমার চাঁদের আবির্ভাব হয়ে যায় । ১২৪০০ ফুট উঁচুতে এই দৃশ্যের বর্ণনা কোনো বিশেষণের অপেক্ষা রাখে না । নাগরিক জীবন, ব্যস্ততা, জটিলতা থেকে বহু দূর এই জায়গা থেকে প্রকৃতির আপন মনে চলতে থাকা এই খেলা নিজের মধ্যেই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক । মানবিক ভাষা এই খেলার পূর্ণাঙ্গীন বর্ণনায় অপারগ । এই যাত্রার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অপেক্ষা করছিল পরের দিন ভোরে । সেই দৃশ্য দেখার জন্য একটু আগেই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের

দিন অন্ধকার থাকতেই থাকতেই হোটেলের ছাদে চলে যাই । অন্যান্য পর্যটকরা সেখানে অবশ্য আগে থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে উপস্থিত ছিলেন । এত দূরে যাওয়া , হাড়কাপানো ঠাণ্ডায় ভোররাতে সুখনিদ্রা ত্যাগ করা, প্রায় অন্ধাকারে এত সময় উন্মুক্ত জায়গায় দাঁড়ানো, উৎসাহ রোমাঞ্চে ভরা মানবমনের উমেদ – না কিছুই বৃথা যায় নি । প্রকৃতি এখানে উদারহস্ত । ভোর পাঁচটা নাগাদ আকাশের পূর্ব দিকে রং বদল শুরু হয়ে যায় । একের পর এক রং এর আবির্ভাব শুরু হয় । অবশেষে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সূর্যোদয় হয় । পাহাড়ের মধ্য থেকে লাল টুকটুকে সূর্য হাসি হাসি মুখে আকাশময় আভা ছড়িয়ে উপরে উঠতে থাকে । সেই রশ্মীর প্রতিফলনে যেন সেজে ওঠে বিপরীত দিকে থাকা পর্বতরাশি । কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে লোৎসে, মাকালু থেকে কুম্বকর্ণ কে নেই এই আনন্দমেলায় । রঙের এই খেলায় একদিকে যেমন আছে এভারেস্ট ও তার মন্ত্রীমণ্ডল তেমনি অন্যদিকে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও পরিবার । এ বলে আমাকে দেখ তো ও বলে আমাকে দেখ অবস্থা । তবে আকাশে সেদিন মেঘের উপস্থিতি বাড়তে থাকায় দূর পর্বতরাশিতে চলতে থাকা এই রঙের উৎসবের ইতি টানা হয়ে গেল । আমরাও ধীরে ধীরে হোটেল রুমে নেমে আসি । প্রাতঃরাশ শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম । এবার উদ্দেশ্য নেপালের একটি ছোট গ্রাম টামলিং । আঁকাবাঁকা রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামে ঘর বলতে মাত্র ৯ টি আছে , সবগুলোতেই পর্যটকদের থাকার সুব্যবস্থা আছে । নেপালীদের আন্তরিক আথিথেয়তা, স্থানীয় সুস্বাদু খাওয়ার এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সন্ধ্যাবেলা যেমন এই হোটেলগুলোর চারিদিকে মেঘ ধেয়ে আসে তেমনি ভোরে এখান থেকে সূর্যোদয় খুব সুন্দর দেখায় । সেখানে রাত কাটিয়ে পরের দিন দুপুরে আমরা ফিরে আসলাম শিলিগুড়ি , বিকালে শিলচরের ট্রেন । কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ।

(C) Ishan Kotha